ফিল গুড প্রোডাক্টিভিটি

চাপ কমিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহজে করার কৌশল

আলী আবদাল

অনুবাদ

ত্বাইরান আবির

কিংফিশার পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ: মে ২০২৬

প্রচ্ছদ: ইমন

সম্পাদনা: আবু আব্দুল্লাহ

পরিবেশক

রকমারি.কম

ওয়াফিলাইফ.কম

ডিস্ট্রিবিউটিং পার্টনার

প্রজন্ম পাবলিকেশন

৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
info@projonmo.pub
www.projonmo.pub

কিংফিশার পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে হিমু মিজি কর্তৃক ৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত।

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Feel Good Productivity by *Ali Abdal*, Published by *Kingfisher Publications*, © *Ali Abdal, Bangla Edition* © Kighfisher Publications

ISBN: 978-984-29068-1-7
Price: BDT 500 Taka
International Price: $20.00 USD

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

পর্ব: এক

অধ্যায় এক: খেলা ১৯

অধ্যায় দুই: ক্ষমতা ৪২

অধ্যায় তিন: মানুষ ৬৬

পর্ব: দুই

অধ্যায় চার: স্বচ্ছতা খুঁজুন ৮৬

অধ্যায় পাঁচ: সাহসের সন্ধান ১১০

অধ্যায় ছয়: শুরু করা ১৩০

পর্ব: তিন

অধ্যায় সাত: সংরক্ষণ ১৪৭

অধ্যায় আট: রিচার্জ ১৬৮

অধ্যায় নয়: সমন্বয় ১৮৪

শেষ কথা ২০৬

ভূমিকা

'শুভ বড়দিন, আলী। চেষ্টা করো কেউ যেন মারা না যায়!'

এ কথা বলেই আমার কনসালট্যান্ট হালকা মেজাজে ফোন রেখে দিলেন। আমাকে একা ফেলে গেলেন পুরো একটি ওয়ার্ডের রোগীদের সামলানোর জন্য। আমি তখন সবেমাত্র পাস করা একজন জুনিয়র ডাক্তার। তিন সপ্তাহ আগে একটি আনাড়ি ভুল করে ফেলেছিলাম—ছুটির আবেদনপত্র জমা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আর তাই বড়দিনের এই দিনে আমি পুরো হাসপাতালের ওয়ার্ড একা সামলাচ্ছি।

দিনের শুরুটা খারাপভাবে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে লাগল। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর আমার সামনে জমা হলো রোগীদের অসংখ্য কেস হিস্ট্রি, ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট আর দুর্বোধ্য সব স্ক্যান রিকোয়েস্ট। এই রিপোর্টগুলো উদ্ধার করা অন-কল রেডিওলজিস্টের চেয়ে কোনো অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে হয়তো সহজ হতো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি দিনের প্রথম জরুরি অবস্থার মুখোমুখি হলাম। পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ব্যক্তি তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। এর ঠিক পরেই একজন নার্স এসে আমাকে জানালেন, এক রোগীর জরুরি ভিত্তিতে 'ম্যানুয়াল ইভাকুয়েশন' প্রয়োজন।

সকাল সাড়ে দশটার দিকে আমি ওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। নার্স জেনিস আতঙ্কে করিডোর 'এ'-তে ছোটাছুটি করছেন; তাঁর দুই হাতে আইভি ড্রিপ আর ওষুধের চার্টে ঠাসা। করিডোর 'বি'-তে এক নাছোড়বান্দা প্রবীণ রোগী তাঁর হারিয়ে যাওয়া দাঁতের পাটির জন্য চিৎকার করছেন। আর করিডোর 'সি' দখল করে নিয়েছে জরুরি বিভাগ থেকে আসা এক মদ্যপ ব্যক্তি, যে ক্রমাগত 'অলিভ! অলিভ!' বলে চিৎকার করছে। (অলিভ কে ছিলেন, তা আমি কখনোই জানতে পারিনি)। এর মাঝেই প্রতি মিনিটে নতুন কোনো না কোনো দাবি আসছিল—'ডক্টর আলী, মিসেস জনসনের জ্বরটা একটু দেখবেন?', 'ডক্টর আলী, মিস্টার সিং-এর পটাশিয়াম বেড়ে গেছে, একটু সাহায্য করবেন?'

এসব দেখে আমি আতঙ্কিত হতে শুরু করলাম। মেডিকেল স্কুল আমাকে এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি করেনি। এর আগ পর্যন্ত আমি বেশ দক্ষ ছাত্র ছিলাম। যখনই কোনো কঠিন পরিস্থিতি আসত, আমার কৌশল ছিল খুব সাধারণ—আরও কঠোর পরিশ্রম করা। সাত বছর আগে এই কৌশলেই আমি মেডিকেল স্কুলে ভর্তির

সুযোগ পেয়েছিলাম। এর মাধ্যমেই আমি একাডেমিক জার্নালে বেশ কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পেরেছি।

এমনকি পড়াশোনার পাশাপাশি একটি ব্যবসাও শুরু করতে পেরেছিলাম। আমার কাছে 'শৃঙ্খলা' বা ডিসিপ্লিনই ছিল কর্মদক্ষতার একমাত্র চাবিকাঠি। আর এটি বেশ ভালোই কাজে দিচ্ছিল। কিন্তু এখন আর তা খাটছে না। কয়েক মাস আগে ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছিল আমি ডুবে যাচ্ছি। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করার পরেও আমি প্রয়োজনীয় সংখ্যক রোগী দেখতে পারছিলাম না বা কাগজপত্রের কাজ শেষ করতে পারছিলাম না। এদিকে আমার মানসিক অবস্থারও অবনতি হচ্ছিল। ডাক্তার হওয়ার প্রশিক্ষণ আমি বেশ উপভোগ করেছিলাম, কিন্তু পেশাদার জীবন আমার কাছে চরম হতাশাজনক মনে হচ্ছিল। সারাক্ষণ আমি এই ভয়ে থাকতাম, আমার কোনো ভুলে হয়তো কেউ মারা যাবে। ফলে আমি ঘুমানো ছেড়ে দিলাম, বন্ধুদের সাথে দূরত্ব তৈরি হলো, পরিবারও আমার কোনো খোঁজ পাচ্ছিল না। সব ছেড়ে আমি শুধু আরও কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিলাম।

আর এখন এই অবস্থা। বড়দিনের দিনে হাসপাতালের ওয়ার্ডে একদম একা; নিজের শিফটটুকুই ঠিকঠাক সামলাতে পারছি না।

সবকিছু চরমে পৌঁছাল তখন, যখন অসাবধানতায় হাত থেকে মেডিকেল সরঞ্জামের একটি ট্রে পড়ে গেল এবং সিরিঞ্জগুলো লিনোলিয়াম মেঝের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি যখন বিষণ্ণ মনে আমার ভেজা স্ক্রাবসের (ডাক্তারি পোশাক) দিকে তাকালাম, তখন বুঝতে পারলাম আমাকে একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। নয়তো সার্জন হওয়ার স্বপ্ন আমার হাতের মুঠো থেকে ফসকে যাবে।

সেদিন রাতে স্টেথোস্কোপ তুলে রাখলাম, একটি 'মিন্স পাই' হাতে নিলাম আর ল্যাপটপ খুললাম। আমি ভাবলাম, একসময় তো আমি বেশ কর্মকুশল ছিলাম। আমি আসলে কী ভুলে গেছি?

মেডিকেল স্কুলের প্রথম বছরে আমি প্রোডাক্টিভিটি বা কর্মদক্ষতার গোপন রহস্য নিয়ে আচ্ছন্ন ছিলাম। সেরা পারফরম্যান্সের চাবিকাঠি খোঁজার আশায় আমি রাতের পর রাত জেগে শত শত আর্টিকেল, ব্লগ পোস্ট আর ভিডিওর নোট নিয়েছি। সব বিশেষজ্ঞরা তখন কঠোর পরিশ্রমের ওপরই জোর দিতেন। বিখ্যাত বক্সার মোহাম্মদ আলীর একটি উক্তি তখন খুব সামনে আসত—'আমি প্রশিক্ষণের প্রতিটি মুহূর্ত ঘৃণা করতাম, কিন্তু নিজেকে বলতাম, হাল ছেড়ো না। এখন কষ্ট করো এবং বাকি জীবন একজন চ্যাম্পিয়নের মতো বাঁচো।'

বড়দিন পেরিয়ে যখন বক্সিং ডে এল, আমি আমার সেই পুরোনো নোটগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম এবং ভাবলাম আমার ঠিক কোথায় ভুল হচ্ছে। আমার কি কেবল আগের সেই কাজের স্পৃহা ফিরিয়ে আনা দরকার? কিন্তু পরের দিন যখন আমি আরও বেশি কাজ করার সংকল্প নিয়ে হাসপাতালে ফিরলাম, তাতে কোনো লাভ হলো না। এমনকি মাঝরাত পর্যন্ত ওয়ার্ডে পড়ে থাকা এবং টয়লেট ব্রেকেও মনে মনে মোহাম্মদ আলীর সেই উক্তি আওড়ানোর পরেও আমার কাগজপত্রের কাজ একটুও দ্রুত শেষ হচ্ছিল না। আমার রোগীরা আলী নামের একজন ক্লান্ত ও অদক্ষ ডাক্তারকেই পাচ্ছিল। আর বড়দিনের আনন্দ তো আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না।

জীবনের কঠিনতম সেই দিনের শেষে আমি নিজেকে পুরোপুরি দিশেহারা অনুভব করছিলাম। ঠিক তখনই হঠাৎ আমার পুরোনো টিউটর ডক্টর বার্কলের কিছু প্রাজ্ঞ কথা মনে পড়ে গেল—'যদি চিকিৎসা কাজে না লাগে, তবে রোগ নির্ণয় নিয়েই নতুন করে ভাবো (কোয়েশ্চেন দ্য ডায়াগনোসিস)।'

ধীরে ধীরে এবং তারপর আকস্মিকভাবেই আমার মনে হতে লাগল, এতকাল আমি যেসব কর্মদক্ষতার পরামর্শ মেনে এসেছি, সেগুলো আসলে কতটুকু সঠিক? সাফল্য কি সত্যিই কেবল কষ্টের দাবি রাখে? আসলে 'সাফল্য' মানেই বা কী? এভাবে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হয়ে টিকে থাকা কি আদৌ সম্ভব? কাজ শেষ করার জন্য সারাক্ষণ চাপে থাকা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আমার স্বাস্থ্য আর সুখ কি অন্য যেকোনো কিছুর বিনিময়ে বিসর্জন দেওয়া উচিত?

এই সত্যটি উপলব্ধি করতে আমার কয়েক মাস সময় লেগেছিল। আমি একটি ধ্রুব সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম—সাফল্য সম্পর্কে আমাকে যা যা বলা হয়েছে, তার সবই ছিল ভুল। আমি কেবল হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে একজন ভালো ডাক্তার হতে পারব না; কেবল কঠোর পরিশ্রমই আমাকে সুখ এনে দেবে না। তৃপ্তি পাওয়ার অন্য একটি পথও আছে, যে পথ সারাক্ষণের উদ্বেগ, অনিদ্রা আর অতিরিক্ত ক্যাফেইনের ওপর নির্ভরশীল নয়।

আমার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর ছিল না। মোটেও না। কিন্তু প্রথমবারের মতো আমি এক বিকল্প পথের আভাস পাচ্ছিলাম। এমন এক পথ, যা কেবল হাড়ভাঙা খাটুনির ওপর নির্ভর করে না, বরং বোঝার চেষ্টা করে কীভাবে কঠোর কাজকেও আনন্দদায়ক করা যায়। এটি এমন এক পদ্ধতি যা আমার মানসিক সুস্বাস্থ্য বা 'ওয়েলবিয়িং'কে সবার আগে গুরুত্ব দেয়; আর এই সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগিয়েই আমার মনোযোগ ও অনুপ্রেরণা বাড়িয়ে তোলে।

এই পদ্ধতিকেই আমি পরবর্তীতে নাম দিয়েছি 'ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটি'।

ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটির বিস্ময়কর রহস্য

মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় কর্মদক্ষতা বা প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে আমার যে পাগলামি ছিল, তার কারণেই আমি বাড়তি এক বছর সময় নিয়ে মনোবিজ্ঞানের (সাইকোলজি) ওপর ডিগ্রি নিয়েছিলাম। যখন আমি ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটির সূত্রগুলো মেলাতে শুরু করলাম, তখন আমার পড়া একটি গবেষণার কথা মনে পড়ে গেল; যেখানে একটি মোমবাতি, এক বাক্স ম্যাচ আর এক বাক্স থাম্বট্যাক (বোর্ড পিন) ব্যবহার করা হয়েছিল।

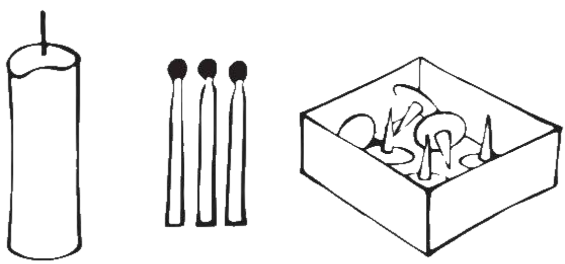

কল্পনা করুন, এই তিনটি বস্তু আপনার সামনে রাখা আছে। আপনার কাজ হলো মোমবাতিটি দেয়ালের কর্কবোর্ডের সাথে এমনভাবে আটকে দেওয়া, যাতে এটি জ্বালালে মোমের ফোঁটা নিচের টেবিলের ওপর না পড়ে। এখন আপনি বস্তুগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছেন আর সমাধান খুঁজছেন। আপনার মাথায় কি কোনো বুদ্ধি আসছে?

যখন এই সমস্যা মানুষের সামনে দেওয়া হয়, বেশিরভাগই কেবল মোমবাতি, ম্যাচ এবং পিন নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু যাদের চিন্তাভাবনা কিছুটা সৃজনশীল, তাঁরা পিনের বক্সটির বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাবনা বুঝতে পারেন। এই ধাঁধার সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো—পিনের বক্সটিকে কেবল একটি পাত্র হিসেবে না দেখে মোমবাতির স্ট্যান্ড বা হোল্ডার হিসেবে ব্যবহার করা।

এটিই হলো 'ক্যান্ডেল প্রবলেম' বা মোমবাতি সমস্যা, যা সৃজনশীল চিন্তাধারার একটি ধ্রুপদী পরীক্ষা। কার্ল ডাঙ্কার প্রথম এটি তৈরি করেন এবং ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে এটি অসংখ্য গবেষণায় ব্যবহৃত হয়ে

আসছে, যেখানে মানুষের মানসিক নমনীয়তা থেকে শুরু করে মানসিক চাপের (স্ট্রাস) প্রভাব পর্যন্ত সবকিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। সত্তরের দশকের শেষদিকে মনোবিজ্ঞানী অ্যালিস ইজেন মানুষের মেজাজ বা 'মুড' কীভাবে তাদের সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে একটি প্রভাবশালী পরীক্ষা চালান এবং এই মোমবাতি সমস্যাকেই তার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন।

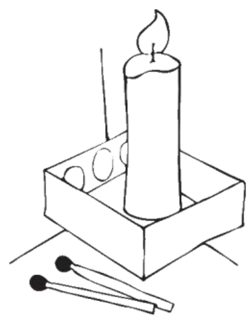

ইজেন তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের দুটি দলে ভাগ করে পরীক্ষাটি শুরু করেন। একদলকে মোমবাতি সমস্যার মুখোমুখি করার আগে একটি ছোট উপহার (এক ব্যাগ চকলেট) দেওয়া হয়েছিল। অন্য দলকে এমন কোনো উপহার ছাড়াই কাজ শুরু করতে বলা হয়েছিল। এখানে তত্ত্বটি ছিল এমন—যাদের চকলেট দেওয়া হয়েছে, ধাঁধা সমাধান করার সময় তাঁদের মেজাজ বেশি ফুরফুরে থাকবে। পরীক্ষায় ইজেন একটি চমৎকার বিষয় লক্ষ করলেন। উপহার পাওয়ার ফলে যাদের মেজাজ ভালো ছিল, তাঁরা মোমবাতি সমস্যা সমাধানে অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন।

সাইকোলজি ডিগ্রির সময় যখন প্রথম ইজেনের এই গবেষণার কথা পড়ি, তখন আমার কাছে এটি বেশ কৌতূহলজনক মনে হলেও খুব বৈপ্লবিক কিছু মনে হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে, দেয়ালে মোমবাতি আটকে দেওয়ার মতো কোনো তীব্র ইচ্ছা আমার কোনোকালেই জাগেনি। কিন্তু একজন জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে যখন এই বিষয়ে ফিরে এলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম ইজেনের এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর। এটি ইঙ্গিত দেয়—ভালো লাগার অনুভূতি কেবল মনের প্রশান্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি আসলে আমাদের চিন্তা ও আচরণের ধরনকেও আমূল বদলে দেয়।

আমি এখন জানতে পারলাম, এই গবেষণা ইতিবাচক আবেগ কীভাবে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এটি

দেখিয়েছে যে, যখন আমরা ফুরফুরে মেজাজে থাকি, তখন আমরা আরও বড় পরিসরে চিন্তা করতে পারি, নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহী হই এবং প্রাপ্ত তথ্য আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারি। অন্য কথায়, ভালো লাগার অনুভূতি আমাদের সৃজনশীলতা ও কর্মদক্ষতা উভয়ই বাড়িয়ে দেয়।

এটি আসলে কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে প্রথম দিকে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বারবারা ফ্রেডরিকসন। চ্যাপেল হিলের ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলাইনার এই অধ্যাপক 'পজিটিভ সাইকোলজি' বা ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। এটি মনোবিজ্ঞানের একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শাখা, যা মানুষের সুখ এবং তা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে কাজ করে। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ফ্রেডরিকসন ইতিবাচক আবেগের একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন, যার নাম দেন 'ব্রডেন অ্যান্ড বিল্ড' থিওরি।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ইতিবাচক আবেগ আমাদের চেতনার পরিধিকে 'বিস্তৃত' করে এবং মানসিক ও সামাজিক সম্পদ 'গড়ে তোলে'। 'বিস্তৃত' বলতে এখানে ইতিবাচক আবেগের তাৎক্ষণিক প্রভাবকে বোঝানো হয়েছে। যখন আমরা ভালো বোধ করি, তখন আমাদের মন উন্মুক্ত হয়; আমরা আগের চেয়ে বেশি তথ্য গ্রহণ করতে পারি এবং আমাদের চারপাশে আরও বেশি সম্ভাবনা দেখতে পাই। মোমবাতি সমস্যার কথা চিন্তা করুন—ইতিবাচক মেজাজে থাকার কারণেই অংশগ্রহণকারীরা অনেক বেশি সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন।

আর 'গড়ে তোলা' বলতে ইতিবাচক আবেগের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবকে বোঝায়। যখন আমরা ইতিবাচক আবেগ অনুভব করি, তখন আমরা মানসিক ও আবেগীয় সম্পদের একটি ভাণ্ডার গড়ে তুলি, যা ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। যেমন—ধৈর্য, সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সামাজিক যোগাযোগ এবং শারীরিক সুস্থতা। সময়ের সাথে সাথে এই দুটি প্রক্রিয়া একে অপরকে শক্তিশালী করে এবং ইতিবাচকতা, উন্নতি ও সাফল্যের একটি ঊর্ধ্বমুখী চক্র তৈরি করে।

ইতিবাচক আবেগ হলো সেই জ্বালানি, যা মানুষের সমৃদ্ধির ইঞ্জিন সচল রাখে।

এই তত্ত্ব আমাদের জীবনে ইতিবাচক আবেগের ভূমিকা বোঝার এক নতুন পথ দেখায়। এগুলো কেবল ক্ষণস্থায়ী কোনো অনুভূতি নয়, যা কোনো প্রভাব ছাড়াই

আসে আর যায়। বরং এগুলো আমাদের মানসিক কার্যকারিতা, সামাজিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিক সুস্থতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কেন 'ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটি' কাজ করে?

যখন আমি প্রথম 'ব্রডেন অ্যান্ড বিল্ড' সম্পর্কে জানতে শুরু করি, তখন আমার জীবন নিয়ে ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। বহু বছর ধরে আমি ভেবে এসেছি, কেবল কঠোর পরিশ্রম করলেই আমি যা চাই তা অর্জন করতে পারব। যদি আমি একজন ভালো ডাক্তার হতে চাই, তবে সামনের দিনগুলো হবে শুধুই হাড়ভাঙা খাটুনি আর বিরামহীন কাজের।

এখন আমি অন্য একটি পথ দেখতে পাচ্ছিলাম। ফ্রেডরিকসনের তত্ত্ব বলছে, ইতিবাচক আবেগ আমাদের মস্তিষ্কের কাজ করার পদ্ধতি বদলে দেয়। এর প্রথম ধাপ হলো ভালো বোধ করা, আর দ্বিতীয় ধাপ হলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আরও বেশি করে করা। কিন্তু কেন এমন হয়? আমি যত বেশি পড়াশোনা করলাম, তত বেশি বুঝতে পারলাম এর ব্যাখ্যা অনেক ধরনের এবং কিছু ক্ষেত্রে তা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে বিজ্ঞানীরা কিছু সুনির্দিষ্ট উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করতে শুরু করেছেন।

প্রথমত, ভালো বোধ করা আমাদের প্রাণশক্তি বা এনার্জি বাড়িয়ে দেয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন এক শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যা কেবল শারীরিক বা জৈবিক নয়; যা কেবল চিনি বা শর্করা থেকে আসে না, বরং আসে অনুপ্রেরণা, মনোযোগ আর উদ্দীপনার সংমিশ্রণ থেকে। এটি সেই শক্তি, যা আপনি অনুভব করেন যখন আপনি খুব মগ্ন হয়ে কোনো কাজ করেন অথবা যখন আপনি অনুপ্রেরণাদায়ক মানুষদের মাঝে থাকেন। এই শক্তির অনেক নাম আছে। মনোবিজ্ঞানীরা একে 'আবেগীয়', 'আধ্যাত্মিক', 'মানসিক' বা 'প্রেরণাদায়ক' শক্তি বলেন। আবার স্নায়ুবিজ্ঞানীরা একে 'জেস্ট', 'ভাইটালিটি' বা 'এনার্জেটিক অ্যারোজাল' নামে ডাকেন। গবেষকরা এর নাম নিয়ে একমত হতে না পারলেও তাঁরা এই বিষয়ে একমত—এটি আমাদের লক্ষ্য অর্জনে মনোযোগী, অনুপ্রাণিত এবং উদ্দীপ্ত করে তোলে।

তাহলে এই রহস্যময় শক্তির উৎস কী? সংক্ষেপে উত্তরটা হলো—ভালো বোধ করা। ইতিবাচক আবেগ মূলত চারটি হরমোনের সাথে যুক্ত: এন্ডোরফিন,

সেরোটোনিন, ডোপামিন এবং অক্সিটোসিন। এদের প্রায়ই ‘ফিল-গুড হরমোন’ বলা হয়। এই সবগুলোই আমাদের আরও বেশি কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চাপ বা ব্যথার সময় সাধারণত এন্ডোরফিন নিঃসৃত হয়, যা সুখের অনুভূতি আনে এবং অস্বস্তি কমায়। এর উচ্চমাত্রা সাধারণত বর্ধিত শক্তি ও অনুপ্রেরণার সাথে সম্পর্কিত। সেরোটোনিন আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ, ঘুম, ক্ষুধা এবং সামগ্রিক সুস্বাস্থ্যের অনুভূতির সাথে যুক্ত। এটি আমাদের তৃপ্তির বোধকে মজবুত করে এবং কাজ দক্ষতার সাথে শেষ করার শক্তি জোগায়। ডোপামিন বা ‘পুরস্কার’ (রিওয়ার্ড) হরমোন অনুপ্রেরণা ও আনন্দের সাথে যুক্ত এবং এর নিঃসরণ আমাদের এমন এক তৃপ্তি দেয় যা দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। আর অক্সিটোসিন ‘ভালোবাসার’ হরমোন নামে পরিচিত। এটি সামাজিক বন্ধন, বিশ্বাস এবং সুসম্পর্ক তৈরির সাথে জড়িত, যা অন্যদের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়, আমাদের মেজাজ ফুরফুরে করে এবং ফলাফলস্বরূপ আমাদের কর্মদক্ষতার ওপর প্রভাব ফেলে।

এর মানে হলো, এই ‘ফিল-গুড’ হরমোনগুলো একটি ইতিবাচক চক্রের সূচনাবিন্দু। যখন আমরা ভালো বোধ করি, তখন আমাদের মধ্যে শক্তি তৈরি হয়, যা আমাদের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আর এই কর্মক্ষমতা আমাদের মধ্যে অর্জনের আনন্দ দেয়, যা আমাদের আবারও ভালো বোধ করতে সাহায্য করে।

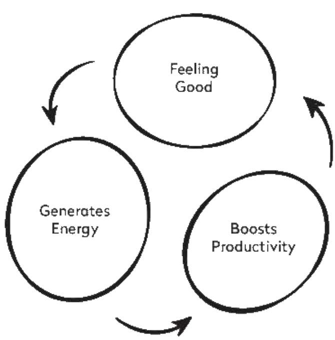

দ্বিতীয়ত, ভালো লাগার অনুভূতি আমাদের মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমিয়ে দেয়। ‘ব্রডেন অ্যান্ড বিল্ড’ থিওরির পাশাপাশি বারবারা ফ্রেডরিকসন এমন কিছু তৈরি করেছেন যাকে মনোবিজ্ঞানীরা ‘আনডুয়িং হাইপোথিসিস’ বলেন। ফ্রেডরিকসন ও

তাঁর সহকর্মীরা গত কয়েক দশকের গবেষণার প্রতি আগ্রহী ছিলেন যেখানে দেখা গেছে—নেতিবাচক আবেগ অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ করে। স্বল্পমেয়াদে এটি কোনো সমস্যা নয়; বিপদ থেকে পালানোর জন্য এই প্রক্রিয়াই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আমরা যদি ঘনঘন এই নেতিবাচক অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাই, তবে উদ্বেগে জর্জরিত হয়ে পড়ি এবং আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এই হরমোনগুলোর ক্রমাগত সক্রিয়তা এমনকি হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে। এটা মোটেও কাম্য নয়।

ফ্রেডরিকসন এর উল্টো দিক নিয়ে ভাবলেন। যদি নেতিবাচক আবেগের ক্ষতিকর শারীরবৃত্তীয় প্রভাব থাকে, তবে হয়তো ইতিবাচক আবেগ এগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। ভালো লাগার অনুভূতি কি স্নায়ুতন্ত্রকে ‘রিসেট’ করে শরীরকে আরও শিথিল অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারে?

এটি পরীক্ষা করার জন্য ফ্রেডরিকসন বেশ কঠিন একটি গবেষণার পরিকল্পনা করেন। গবেষকরা একদল মানুষকে বললেন—জনসমক্ষে তাঁদের একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মাত্র এক মিনিট সময় আছে, যা ভিডিও করা হবে এবং তাঁদের সহকর্মীরা সেটি বিচার করবেন। যেহেতু জনসমক্ষে কথা বলার ভয় প্রায় সবার মধ্যেই থাকে, তাই ফ্রেডরিকসন ধারণা করেছিলেন এটি অংশগ্রহণকারীদের উদ্বেগ ও স্ট্রেসের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। আর হলোও তাই; তাঁরা আগের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলেন এবং তাঁদের হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বেড়ে গেল। এরপর গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের এলোমেলোভাবে চারটি চলচ্চিত্রের যেকোনো একটি দেখতে দিলেন। এর মধ্যে দুটি ছিল হালকা ইতিবাচক আবেগের, তৃতীয়টি ছিল নিরপেক্ষ এবং চতুর্থটি ছিল বিষাদময়। এরপর তাঁরা মেপে দেখলেন সেই স্ট্রেস থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে কার কতক্ষণ সময় লাগে।

এর ফলাফল ছিল চমকপ্রদ। যাঁরা ইতিবাচক আবেগের চলচ্চিত্র দেখেছিলেন, তাঁদের হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অনেক কম সময় লেগেছিল। আর যাঁরা বিষাদময় চলচ্চিত্র দেখেছিলেন, তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছিল।

এটিই ‘আনডুয়িং হাইপোথিসিস’। অর্থাৎ, ইতিবাচক আবেগ স্ট্রেস ও অন্যান্য নেতিবাচক আবেগের প্রভাব ‘মুছে’ দিতে পারে। যদি স্ট্রেস সমস্যা হয়, তবে ভালো লাগার অনুভূতিই হতে পারে তার সমাধান।

তবে ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটির শেষ ও সম্ভবত সবচেয়ে বৈপ্লবিক দিক যেকোনো সুনির্দিষ্ট কাজ বা প্রকল্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ তৃতীয়ত, ভালো লাগার অনুভূতি আপনার জীবনকে সমৃদ্ধ করে। ২০০৫ সালে একদল মনোবিজ্ঞানী সুখ ও সাফল্যের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক নিয়ে হওয়া যত গবেষণা পাওয়া সম্ভব, তার সব পড়ে দেখেন। তাঁরা ২২৫টি প্রকাশিত গবেষণাপত্র খুঁটিয়ে দেখেন, যেখানে প্রায় ২,৭৫,০০০ মানুষের তথ্য ছিল। তাঁদের প্রশ্ন ছিল—সাফল্য কি আমাদের সুখী করে নাকি সুখই আমাদের সফল হতে সাহায্য করে?

গবেষণাটি অকাট্য প্রমাণ দেয় যে, আমরা আসলে সুখের ধারণাটি ভুলভাবে বুঝেছি। যাঁরা নিয়মিত ইতিবাচক আবেগ অনুভব করেন, তাঁরা কেবল বেশি মিশুক, আশাবাদী এবং সৃজনশীলই হন না, তাঁরা অনেক বেশি সফলও হন। এই মানুষগুলো তাঁদের পরিবেশে এক ধরনের সংক্রামক শক্তি ছড়িয়ে দেন। তাঁদের সম্পর্কগুলো হয় অনেক বেশি তৃপ্তিদায়ক, তাঁরা উচ্চ বেতন পান এবং কর্মজীবনে দারুণ সাফল্য দেখান। যাঁরা কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক আবেগ লালন করেন, তাঁরা ক্রমশ বদলে যান। তাঁরা আরও দক্ষ সমস্যা-সমাধানকারী, পরিকল্পনাকারী, সৃজনশীল চিন্তাবিদ এবং সহনশীল ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁরা কম মানসিক চাপে ভোগেন, ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে উচ্চতর মূল্যায়ন পান এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিক অনুগত থাকেন।

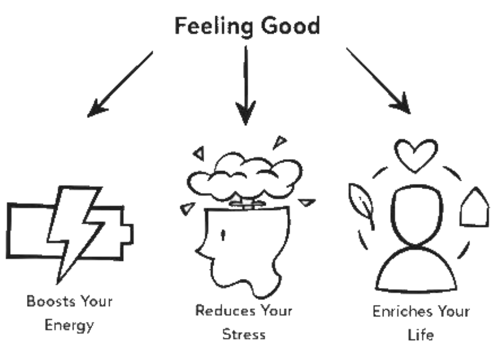

সাফল্য ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করে না। বরং ভালো লাগার অনুভূতিই সাফল্য নিয়ে আসে। সহজ কথায়—সাফল্য আপনাকে ভালো বোধ করায় না; বরং আপনি যখন ভালো বোধ করেন, তখনই সাফল্য ধরা দেয়।

এই বইটি যেভাবে ব্যবহার করবেন

ডাক্তার হিসেবে সেই প্রথম যন্ত্রণাদায়ক বছরে এই আবিষ্কারগুলোর অনেক কিছুই আমার কাছে অজানা ছিল। আমি তখন বিরামহীন শিফটে কাজ করছিলাম। আর রোগীদের দেখার মাঝে যতটুকু সামান্য সময় পেতাম, তার মধ্যেই কোনোমতে প্রোডাক্টিভিটি সংক্রান্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেই শুরুতে আমি যা কিছু জানতে পেরেছিলাম, সেটুকুই কাজের সাথে আমার সম্পর্ক বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। যখন আমি কঠোর শৃঙ্খলার পেছনে ছোটার নেশা ত্যাগ করে কাজকে আনন্দদায়ক করার দিকে মনোযোগ দিলাম, তখন আমার সেই ভয়াবহ শিফটগুলো সহজ হতে শুরু করল। খুব দ্রুতই আমার মেজাজ বা মুড উন্নত হতে লাগল।

'ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটি' আবিষ্কারের কয়েক মাস পরের কথা। আমার এক প্রবীণ রোগীর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, 'জানেন ডাক্তার সাহেব, পুরো সপ্তাহের মধ্যে আপনিই এখানে প্রথম ব্যক্তি যিনি একটু হাসলেন।' এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ডাক্তার হিসেবে আমার কাজের ধরনই বদলে দেয়নি, বরং আমার জীবনের মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি কাজের গণ্ডির বাইরে থাকা সুযোগগুলো দেখতে শুরু করলাম—আমার বন্ধুত্ব, পরিবার আর সেইসব ভালো লাগার কাজ যা আমি একপাশে সরিয়ে রেখেছিলাম। দ্রুতই মনে হলো, আমার এই আবিষ্কার অন্যদের সাথেও শেয়ার করা দরকার। কয়েক বছর ধরে আমি একটি ইউটিউব চ্যানেল চালাচ্ছিলাম, যেখানে পড়াশোনার টিপস ও প্রযুক্তি বিষয়ক রিভিউ দিতাম। এখন আমি মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞান থেকে শেখা কার্যকর বিষয়গুলো শেয়ার করতে শুরু করলাম। আমি নিজেকেই 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহার করে আমার শেখা প্রতিটি কৌশল ও পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম।

'সাফল্যের সাথে কষ্টের কোনো সম্পর্ক থাকতে হবে না'—আমার এই বৈপ্লবিক ধারণা যখন জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করল, তখন আমি দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর ইমেইল পেতে থাকলাম। হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় দারুণ ফলাফল করল, ব্যবসায়ীরা তাদের আয় দ্বিগুণ করল, অভিভাবকরা কাজ ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে আরও ভালো ভারসাম্য আনতে সক্ষম হলেন। আর এই সবই হলো আমার শেয়ার করা কৌশল কাজে লাগিয়ে। এমনকি করপোরেট জীবনের যাঁতাকলে পিষ্ট অভিজ্ঞ পেশাজীবীরাও নতুন শক্তি, অনুপ্রেরণা এবং জীবনের নতুন দিশা খুঁজে পাচ্ছিলেন।

আর আমি নিজেও তাই পেলাম। আমি যত বেশি পড়লাম, আমার দর্শন তত বেশি বিকশিত হলো। শেষ পর্যন্ত, আমি যেসব নীতি ও কৌশল নিয়ে শিখছিলাম সেগুলো নিজে প্রয়োগ করে উপলব্ধি করলাম, নতুন কিছু করার জন্য আমার চিকিৎসা পেশা থেকে বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমাকে এই বইটি লিখতে হবে। এই বইয়ের পাতায় যা আছে তা কেবল অন্য কোনো গতানুগতিক প্রোডাক্টিভিটি সিস্টেম নয় যা আপনাকে যেকোনো মূল্যে বেশি কাজ করতে শেখাবে। এটি মূলত আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আরও বেশি করে করার বিষয়ে রচিত। এটি আপনাকে নিজের সম্পর্কে, আপনার পছন্দের কাজ এবং আপনাকে আসলে কী অনুপ্রাণিত করে তা আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

আমার এই পদ্ধতির তিনটি অংশ রয়েছে, যার প্রতিটি 'ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটি'র ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে:

প্রথম অংশে: আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটির বিজ্ঞান ব্যবহার করে নিজেকে উজ্জীবিত বা চনমনে রাখা যায়। এটি মূলত তিনটি 'এনার্জাইজার'—খেলা বা আনন্দ, ক্ষমতা এবং মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় অংশে: দেখানো হয়েছে কীভাবে ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটি আমাদের কাজ জমিয়ে রাখা বা আলসেমি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। এখানে আপনি তিনটি 'ব্লকার' বা বাধা সম্পর্কে জানবেন—অনিশ্চয়তা, ভয় এবং জড়তা।

তৃতীয় অংশে: আমরা দেখব কীভাবে ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটি আমাদের দীর্ঘমেয়াদে সচল রাখতে পারে। আমরা এখানে তিন ধরণের 'বার্নআউট'—অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত, শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া এবং লক্ষ্যবিচ্যুতিজনিত বার্নআউট নিয়ে আলোচনা করব।

প্রতিটি অধ্যায়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহারিক টিপস রয়েছে। তবে এই বইয়ে আমার লক্ষ্য আপনাকে একগাদা কাজের তালিকা ধরিয়ে দেওয়া নয়, বরং একটি জীবনদর্শন উপহার দেওয়া। কর্মদক্ষতা বা প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে ভাবার এমন এক নতুন পথ দেখানো, যা আপনি নিজের জীবনে নিজের মতো করে প্রয়োগ করতে পারেন। আমি আশা করি এই বইটি পড়ার পর আপনি একজন শৌখিন 'প্রোডাক্টিভিটি বিজ্ঞানী' হয়ে উঠবেন, যিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে দেখবেন কোনটি আপনাকে ভালো বোধ করতে এবং আরও বেশি অর্জন করতে সাহায্য করে। এই কারণেই প্রতিটি অধ্যায়ে কেবল তিনটি সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত আইডিয়াই নেই, বরং ছয়টি করে 'এক্সপেরিমেন্ট' বা পরীক্ষা রয়েছে যা আপনি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন।

আপনাকে কী ভালো বোধ করায় তা বোঝার ও প্রয়োগ করার মাধ্যমে আপনি কেবল আপনার কাজকেই বদলে ফেলবেন না, জীবনকেও বদলে ফেলবেন। ফিল-গুড প্রোডাক্টিভিটি একটি সহজ পদ্ধতি, কিন্তু এটি সবকিছু বদলে দেয়। এটি আমাদের দেখায়, আপনি যদি কখনো নিজেকে পানির নিচে ডুবে যাওয়ার মতো দিশেহারা অনুভব করেন, তবে কেবল ভেসে থাকার চেষ্টাতেই থমকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি চাইলে সাঁতার কাটতেও শিখতে পারেন।

চলুন শুরু করা যাক।

পর্ব: এক

উজ্জীবিত করা

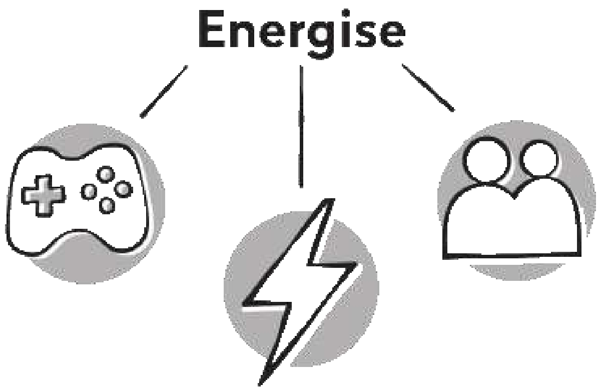

প্রথম অধ্যায়

খেলা

কাগজে-কলমে প্রফেসর রিচার্ড ফাইনম্যানের ক্যারিয়ারের সবকিছুই নিখুঁত মনে হচ্ছিল। মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই তিনি তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন, যাকে ভাবা হতো নিউক্লিয়ার এনার্জির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পথপ্রদর্শক। সেই সময় তিনি নিউইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটির সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপকদের একজন হিসেবে নিযুক্ত হন।

কিন্তু সমস্যা ছিল একটাই—পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এক গভীর বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল।

এই সমস্যার শুরু ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। প্রতিবার যখনই তিনি কিছু নিয়ে ভাবতে বসতেন, তাঁর কেবল ক্লান্ত লাগত। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে, আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর স্ত্রী আরলিন যক্ষ্মায় মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই তরুণ অধ্যাপকের জীবনের সব ছন্দ হারিয়ে গিয়েছিল। যে ধারণা একসময় পিএইচডি ছাত্র থাকাকালীন তাঁকে রোমাঞ্চিত করত, সেগুলো এখন তাঁর কাছে নিস্প্রাণ আর একঘেয়ে লাগত। শিক্ষকতায় তিনি বেশ দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এটি তাঁর কাছে চরম বিরক্তিকর আর বোঝা মনে হতো। পরবর্তীতে তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, ‘আমি আসলে পুরোপুরি বার্নআউটের শিকার হয়েছিলাম।’

তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি প্রায়শই লাইব্রেরিতে যেতাম এবং আরব্য রজনীর গল্প পড়তাম। কিন্তু যখন গবেষণার কাজ করার সময় আসত, আমি কাজে মন বসাতে পারতাম না। আমার কোনো আগ্রহই ছিল না।’

তিনি খেয়াল করলেন, কোনো কাজ না করে বসে থাকা বেশ সহজ। তিনি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের পড়াতে, লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করতে এবং ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। কিন্তু গবেষণার কাজ তাঁর একদম ভালো লাগত না। বিষয়টি বেশ সহজ হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে ফাইনম্যান তাঁর এক নতুন পরিচয় মেনে নিলেন—তিনি পদার্থবিজ্ঞানের এমন একজন অধ্যাপক, যিনি কোনো পদার্থবিজ্ঞান চর্চাই করেন না।

যতক্ষণ না একদিন সবকিছু বদলে গেল। সমস্যা শুরু হওয়ার কয়েক বছর পরের কথা। একদিন ফাইনম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় একা বসে ছিলেন। তাঁর উল্টো দিকে একদল শিক্ষার্থী বসে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বারবার একটি প্লেট শূন্যে ছুড়ে দিচ্ছিল। ফাইনম্যান অদ্ভুত এক বিষয় লক্ষ করলেন। প্লেটটি যখন শূন্যে ভাসছিল, তখন এটি কাঁপছিল। কিন্তু প্লেটের ওপর খোদাই করা কর্নেল ইউনিভার্সিটির লোগোটি প্লেটের চেয়েও দ্রুত কাঁপছে বলে মনে হচ্ছিল।

কৌতূহলী ফাইনম্যান ভাবলেন, বিষয়টা বেশ অদ্ভুত। কিন্তু এটা তো আর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়! তিনি সেই মানুষ, যিনি নিউক্লিয়ার ফিশনের রহস্য সমাধানে সাহায্য করেছিলেন। বাতাসে উড়ন্ত তৈজসপত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে থিওরি দেওয়া তাঁর কাজ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কৌতূহলের সেই মুহূর্ত তাঁর মনে এক সামান্য উপলব্ধির জন্ম দিল। তিনি ভাবতে শুরু করলেন, ঠিক কোন বিষয়টি তাঁকে প্রথম এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পরে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন, 'আমি পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করে আনন্দ পেতাম।'

'কেন আমি এটা উপভোগ করতাম? কারণ আমি এটা নিয়ে খেলতাম। আমার যা করতে মন চাইত, আমি তা-ই করতাম। এটা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি না, সেটা বড় কথা ছিল না। বরং খেলা করার মতো বিষয়টি আমার কাছে কত আকর্ষণীয় আর মজার ছিল, এটাই ছিল আসল।'

ক্যাফেটেরিয়া থেকে বের হওয়ার পর ফাইনম্যান তাঁর কিশোর বয়সে পৃথিবীকে যেভাবে দেখতেন, তা মনে করতে লাগলেন। হাইস্কুলে পড়ার সময় পৃথিবীর যেসব জিনিস তাঁকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত, অন্যদের কাছে সেগুলো ছিল খুবই সাধারণ। তিনি দেখতেন কলের মুখ থেকে পানি নিচে পড়ার সময় যত দূরে যায় তত সরু হয়ে আসছে, আর তিনি ভাবতেন এই বক্ররেখা কিসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় তা তিনি বের করতে পারেন কি না। তিনি বলেন, 'আমার এটা করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এমনকি অন্য কেউ হয়তো এটি আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এতে কিছু যায় আসত না। আমি স্রেফ নিজের বিনোদনের জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করতাম আর জিনিসপত্র নিয়ে খেলতাম।'

যথারীতি ফাইনম্যান ভাবলেন—যদি সেই পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে যাওয়াই পদার্থবিজ্ঞানে আবারও আনন্দ খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি হয়? পদার্থবিজ্ঞানকে কোনো চাকরি হিসেবে না দেখে যদি মজার কোনো খেলা হিসেবে দেখা যায়? তিনি সিদ্ধান্ত